জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ

৭৩ তম অধিবেশন

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘ সদর দপ্তর।
নিউ ইয়র্ক
বৃহস্পতিবার
২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।

জাতিসংঘের ৭৩ বছরের ইতিহাসে চতুর্থ নারী হিসেবে সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘের প্রতি আপনার অঙ্গীকার সুরক্ষায় আপনার যেকোন প্রচেষ্টায় আমার প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে থাকবে অকুন্ঠ সহযোগিতা।

একইসঙ্গে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহসী ও দৃঢ় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমি জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব অ্যান্টনিও গুটেরেস-কে অভিবাদন জানাই।

জনাব সভাপতি,

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের জন্য আপনার নির্ধারিত প্রতিপাদ্য আমাকে অতীতের কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতির পাতায় নিয়ে গেছে। চুয়াল্লিশ বছর আগে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বাবা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন: আমি উদ্ধৃত করছি “মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারা বিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। এই দুঃখদুর্দশা-

সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল"। উদ্ধৃতি শেষ।

জনাব সভাপতি,

আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। যেখানে ৯০ ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করত। দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। এই দীর্ঘ সংগ্রামে প্রায় ১৪ বছরই তিনি কারাগারে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বার বার।

স্বাধীনতা অর্জনের পর একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত, অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। দেশের মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জনগণের। মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইসঙ্গে তারা আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা, আমার তিন ভাই, যাদের মধ্যে ছোট ভাইটির বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর, নবপরিণীতা দুই ভ্রাতৃবধুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে। আমি ও আমার ছোটবোন

শেখ রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে যাই। কিন্তু আমরা দেশে ফিরতে পারিনি। সে সময়কার ক্ষমতা দখলকারী সামরিক একনায়ক ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে খুনীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আমরা এই নৃশংস হত্যার বিচার চাওয়ার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছিলাম।

জনাব সভাপতি,

বিশ্বব্যাপী বিপুলসংখ্যক নিপীড়িত ও রোহিঙ্গাদের মত নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে। এ জাতীয় ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে শান্তিপূর্ণ, ন্যায্য ও টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের মানুষের উপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল মিয়ানমারের ঘটনা সে কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানীরা ৩০ লাখ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। ২ লাখ নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। এক কোটি মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার বাবাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আমার মা, ছোট দুই ভাই, বোনসহ আমিও বন্দি হই। সে সময় আমি সন্তান-সম্ভবা ছিলাম। আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় বন্দি অবস্থায়। নোংরা ও স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশে আমাদের থাকতে হত।

বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের যে বিবরণ জাতিসংঘের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তাতে আমরা হতভম্ব। আমরা আশা করি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের উপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে।

জনাব সভাপতি,

একজন মানুষ হিসেবে রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশাকে আমরা যেমন অগ্রাহ্য করতে পারি না, তেমনি পারি না নিশ্চুপ থাকতে। আমার পিতামাতাসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার পর আমাকেও দীর্ঘ ছয় বছর দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি। আমরা দুই বোন শরণার্থী হিসেবে বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই আপনজন হারানো এবং শরণার্থী হিসেবে পরদেশে থাকার কষ্ট আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ও অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্দশার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে গত বছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আমি পাঁচ-দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। আমরা আশাহত হয়েছি, কেননা আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্থায়ী ও টেকসই প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়নি।

মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী দেশ। প্রথম থেকেই আমরা তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার-এর মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে, মিয়ানমার মৌখিকভাবে সব সময়ই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে বলে অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে তারা কোন কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না।

বাংলাদেশে অবস্থানরত এগার লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা সাধ্যমত তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা করেছি। এ ক্ষেত্রে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা সহানুভুতি দেখিয়েছেন এবং সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এজন্য আমি তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

রোহিঙ্গারা যতদিন তাঁদের নিজ দেশে ফেরত যেতে না পারবেন, ততদিন সাময়িকভাবে তাঁরা যাতে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করতে পারেন, সে জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে আমরা নতুন আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে রোহিঙ্গারা যাতে সেখানে

যেতে পারেন তার জন্যও আমি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা চাচ্ছি।

যেহেতু রোহিঙ্গা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে মিয়ানমারে তাই এর সমাধানও হতে হবে মিয়ানমারে। আমরা দ্রুত রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই। জাতিসংঘের সঙ্গে মিয়ানমারের যে চুক্তি হয়েছে আমরা তারও আশু বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা দেখতে চাই।

জনাব সভাপতি,

গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অধীনে ৫৪টি মিশনে এক লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়'শ দশ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ১৪৫ জন শান্তিরক্ষী জীবনদান করেছেন। বর্তমানে ১০টি মিশনে 144 জন নারী শান্তিরক্ষীসহ বাংলাদেশের মোট সাত হাজারের অধিক শান্তিরক্ষী নিযুক্ত রয়েছেন। আমাদের শান্তিরক্ষীগণ তাঁদের পেশাদারিত্ব, সাহস ও সাফল্যের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। এছাড়া, Peacekeeping Capability Readiness System-এ ২৩টি কন্টিনজেন্ট প্রেরণের জন্য আমরা অঙ্গীকার করেছি।

নিরাপদ, নিয়মিত ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন বিষয়ক Global Compact-এর মূল প্রবক্তা হিসেবে আমরা আরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং

মানবাধিকার কেন্দ্রিক একটি কম্প্যাক্ট প্রত্যাশা করেছিলাম। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অভিবাসন বিষয়ক এই কম্প্যাক্টকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় এটি একটি ক্রমঃপরিবর্ধনশীল দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদসহ সকল সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রতিবেশী দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী কোন কার্যক্রম বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে আমরা পরিচালিত হতে দিব না। সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় আমাদের 'zero tolerance' নীতি অব্যাহত থাকবে।

সহিংস উগ্রবাদ, মানবপাচার ও মাদক প্রতিরোধে আমাদের সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করার নীতি বিশেষ সুফল বয়ে এনেছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গৃহীত Global Call to Action on the Drug Problem-এর সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

জনাব সভাপতি,

২০০৯ সাল থেকে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করে চলেছি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে আমরা জনগণের সকল প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট রয়েছি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বৈশ্বিক মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের এই যাত্রাপথ আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিকল্পনার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত, যা আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়নে পুরোপুরি অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালে আমাদের নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের বিবেচনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরে ছিল শতকরা ৭.৮৬ ভাগ। মূল্যস্ফীতি বর্তমানে ৫.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের শতকরা ৪১.৫ ভাগ থেকে শতকরা ২১.8 ভাগে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে হত দরিদ্রের হার ২৪ শতাংশ থেকে ১১.3 শতাংশে নেমে এসেছে।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকারী বিনিয়োগ ২০০৯ সালে ছিল শতকরা ৪.৩ ভাগ। ২০১৮ সালে তা ৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন

সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট হতে ২০১৮ সালে ২০ হাজার মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমরা কয়লাভিত্তিক সুপারক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছি। সঞ্চালন লাইনবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঁচ দশমিক পাঁচ (৫.৫) মিলিয়ন সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের ৯০ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে আমরা পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহার যুগে প্রবেশ করেছি।

বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপক এবং অপরিসীম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কর রেয়াত, দ্বৈতকর পরিহার, শুল্কছাড়সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। আমরা ১০০টি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করছি যা প্রায় দশ মিলিয়ন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

জনাব সভাপতি,

জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের যৌথ উদ্যেগে ১১টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে, আমি বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের কাছে পানির যথাযথ মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানাই। অন্যথায় আমরা আমাদের ভবিষ্যত

প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকব। সকলের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ বাস্তবায়নে আমার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ স্যানিটেশন এবং ৮৮ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানির সুবিধা পাচ্ছেন।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ছয় দশমিক পাঁচ (৬.৫) মিলিয়ন বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্ত নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন।

২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। চলতি বছর তেতাল্লিশ দশমিক সাত-ছয় (৪৩.৭৬) মিলিয়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে তিনশ চুয়ান্ন দশমিক নয়-দুই (৩৫৪.৯২) মিলিয়ন বই বিতরণ করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির বই এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষার বই দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক হতে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রায় কুড়ি দশমিক শূন্য-তিন (20.03) মিলিয়ন শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। চৌদ্দ (১৪) মিলিয়ন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মায়েদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পৌঁছে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত

হয়েছে। শিক্ষার হার গত সাড়ে ৯ বছরে শতকরা ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বায়াত্তর দশমিক নয় (৭২.৯) শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের অনন্য এবং উদ্ভাবনী আর্থ-সামাজিক পদক্ষেপসমূহ বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সঞ্চয়কারীগণ যে পরিমাণ টাকা জমা করেন, সরকার সমপরিমাণ অর্থ তাঁর হিসাবে জমা করে। আমরা গৃহহীন নাগরিকমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (shelter project) গ্রহণ করেছি। আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হল নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ। নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন আমরা নিশ্চিত করছি।

সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনাবেতনে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫৩-৪৭। ২০০৯ সালের শুরুতে যা ছিল ৩৫-৬৫।

বাংলাদেশের সংসদই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র সংসদ যেখানে সংসদ নেতা, সংসদ উপনেতা, স্পীকার এবং বিরোধী দলীয় নেতা নারী। বর্তমান সংসদে ৭২ জন নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

কৃষি, সেবা ও শিল্পখাতে প্রায় ২০ মিলিয়ন নারী কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সর্ববৃহৎ উৎস তৈরি পোশাক খাতে প্রায় চার দশিমক পাঁচ (৪.৫) মিলিয়ন কর্মীর ৮০ শতাংশই নারী। নারী উদ্যোক্তাদের জামানত ছাড়াই ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ব্যাংক ঋণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিলের ১০ শতাংশ এবং শিল্প প্লটের ১০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। মাত্র একশ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূখণ্ডে ১৬০ মিলিয়নের বেশি মানুষের বসবাস। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক সূচকে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছি।

মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি ১০০ হাজারে ১৭০ এবং পাঁচ বছর বয়সের নীচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ২০০৯ সালের ৬৪ বছর থেকে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছরে আমাদের জাতীয় বাজেটের পাঁচ দশমিক তিন-নয় (৫.৩৯) শতাংশ আমরা স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করেছি। এ বছর স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৩০ প্রকারের ঔষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অনুযায়ী আমরা যক্ষা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করেছি। যারফলে গত দুই বছরে যক্ষাজনিত মৃত্যুর হার ১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

অটিজম ও জন্মগত স্নায়ুরোগে আক্রান্ত শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছি। এ বিষয়ে আমাদের কার্যক্রমকে জোরদার করতে এ সংক্রান্ত একটি সেল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া অটিজম বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অ্যাডভাইজরি প্যানেলের সদস্য সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ এশিয়ার শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

জনাব সভাপতি,

আমরা জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক High Level Panel on Digital Cooperation প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাই। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার মূল দর্শন হল জনগণের কল্যাণ। ইন্টারনেটভিত্তিক সেবার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে।

বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট "বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১" মহাকাশে উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা মহাকাশ প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছি। বস্তুত এটি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন। ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন প্রথমবারের মত বাংলাদেশে স্যাটেলাইট ভূকেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে তিনি যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি। ভূপ্রকৃতি এবং জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

আমরা প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে আমরা আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের এক

শতাংশ ব্যয় করছি এবং জলবায়ু সহায়ক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করছি। আগামী পাঁচ বছরে বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ ২২ শতাংশ হতে ২৪ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ এবং ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য- সুন্দরবন সংরক্ষণে পঞ্চাশ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে।

আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সক্ষমতা সৃষ্টিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে একীভূত করে আমরা বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ শীর্ষক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি জলকেন্দ্রিক, বহুমুখী এবং টেকনো-ইকনমিক দীর্ঘমেয়াদি একটি পরিকল্পনা। স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা কিনা দীর্ঘ ৮২ বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জনাব সভাপতি,

ভ্রাতৃপ্রতীম ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন আজও অব্যাহত রয়েছে যা আমাদের মর্মাহত করে। এ সমস্যার আশু নিষ্পত্তি প্রয়োজন। ওআইসি-র পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে আমরা ওআইসি-র মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাব।

জনাব সভাপতি,

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তিনটি মৌলিক উপাদান বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে, তা হল - শান্তি, মানবতা ও উন্নয়ন। তাই মানব সমাজের কল্যাণে আমাদের মানবতার পক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণকে সেবা প্রদান এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ। মানবতা ও সৌহার্দ্যই আমাদের টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমস্যা-সঙ্কুল এই পৃথিবীতে আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ, সমন্বিত দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বই মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি। গত সাড়ে নয় বছরে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। যে বাংলাদেশকে বলা হত দুর্যোগ, বন্যা-খরা-হাড্ডিসার মানুষের দেশ, তা এখন বিশ্বশান্তি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশিদের ছাপিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আমাদের পথচলা এখনও শেষ হয়নি। এ পথচলা ততদিন চলবে যতদিন না আমরা আমাদের জাতির

পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

ধন্যবাদ জনাব সভাপতি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।